ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে আছে ছড়া। বাঙলাদেশেও অনুরূপভাবে প্রচলিত আছে প্রচুর সংখ্যক ছড়া। তৎকালীন সময়ে তো বটেই আজ পর্যন্ত যার জনপ্রিয়তা সর্বাত্মক। এই ছড়াগুলির সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়ে সকলেই একমত হন যে, এগুলি ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নয় বরং সচেতন মনের অনায়াস সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন - "আপনি জন্মিয়াছে একথা বলিবার মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ। বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর পৃথিবীর বাষ্প এই আবর্তিত, আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত, উত্তীর্ণ খন্ডাংশ সকল - সর্বদাই নিরর্থক ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ।" [১]

লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য শাখাগুলির মধ্যে ছড়া প্রধান ও অন্যতম সাহিত্য শাখা, মানুষের মননশীলতার আদি যুগ থেকে অর্থাৎ মানব সমাজ যখন থেকে মনের ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেছে ধরা যায় তখন থেকেই মানুষ সৃষ্টিশীলতার আনন্দে যা রচনা করেছে তা হল ছড়া, বলা চলে অন্তরের তাগিদ থেকেই ছড়া আপনা আপনি সৃষ্টি হয়। তারপর তা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এককাল থেকে অন্যকালে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কোনো এক কালে এই ছড়া ব্যষ্টি বিশেষের রচনা হয়েছিল এখন তা সমষ্টির সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ছড়ার রচয়িতারা আজ অন্তর্হিত কিন্তু তাদের সৃষ্টি থেকে গেছে অবিনশ্বর হয়ে।

আচার্য সুকুমার সেন বলেন - "যে রচনা কোনো ব্যক্তি বিশেষের তৈরী বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোনো এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষেয় ছেলেমি ছড়া গান-গল্পকে শিশু বেদ বললে বোধ করি খুব অসংগত হয় না।[২]

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেন - "ছড়া লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে রচিত হয়। প্রথমে সমষ্টি কর্তৃক গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে পুনঃ সৃষ্টি তত্ত্বের নিরিখে (Creation theory) শেষে একটি নির্দিষ্ট রূপলাভ করে। লৌকিক ছড়ার তাই রচয়িতা বা রচয়িত্রীর সন্ধান মেলে না। লোকসাহিত্যের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। চরিত্র ধর্মে ছড়া অত্যন্ত নমনীয় (Flexible)। তাই লৌকিক ছড়ার পাঠান্তর বা একই text এর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ লভ্য।" [৩]

বাঙলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- "ভাবের দিক দিয়া যেমন ইহাতে পরিণতি নাই, কেবলমাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিতমাত্র আছে, রূপের ভিতর দিয়াও ইহার তেমনি অপরিণতি রহিয়াছে, অথচ ইহার এমনিই ধর্ম যে, ভাবের দিক দিয়া ইহার অপরিণতি ইহার রসগ্রাহীকে আঘাত করে না। কারণ ইহা যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশি, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় বড়; অতএব হৃদয় ভরিয়া হৃদয়ের সৃষ্টি গ্রহণ করিতে কেহ বাধা বোধ করে না।"[৪]

বলা চলে, স্বল্প শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত সরল গ্রামীণ জনসাধারণ তাদের চতুষ্পার্শ্বের দেখা জীবনকেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ছড়ার আকারে মৌখিকভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। পরবর্তীকালে মানুষ এইসব ছড়ার ব্যবহারিক প্রয়োগে সাহিত্য সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাই অকারণ আনন্দরসের অভিব্যক্তি লৌকিক ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেলেও এগুলি আসলে ছড়ার বহিরাঙ্গিক অবয়ব। আসল

কথা হল আনন্দের হালকা রস পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে ছড়াগুলি একটি সুমহান সামাজিক দায়িত্বও পালন করে। ছড়ার অন্তরের কথাটি হল সমাজ-চিত্র তথা সমাজ বন্ধন।

ডঃ ওয়াকিল আহমেদ বলেন -"ছড়া আবোল-তাবোল রচনা বা স্বপ্নদর্শী মনের সৃষ্টি আজ আর একথা বলা চলে না। ছড়ায় স্বপ্নকথা আছে তবে তা ছড়ার বিন্যাস রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশে। ছেলে ভুলানো ছড়ার কতকাংশ বাস্তব, কতকাংশ স্বপ্ন। স্বপ্ন সামান্যই বাস্তব কথা বেশি। অন্য অন্য শ্রেণির ছড়ায় মানুষ, সমাজ, সংসার প্রভৃতি বিশ্বলোকের নানা বাস্তব চিত্র আছে, 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল' ছড়ায় স্বপ্নকথা কোথায়? জাতির ইতিহাসের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর ছড়ায় বহু বিবাহের চিত্র আছে; শিবঠাকুর নামে মাত্র পৌরাণিক; তার স্ত্রীর সংখ্যা তিন। এর অনেক বেশি স্ত্রী আছে, বাঙালি সমাজে এমন পরিবারের অভাব নেই। এখানে কল্পনা কোথায়? সবটাই বাস্তব; অতীত তিক্ত স্মৃতি কতক শব্দ চিত্রে জমাট বেঁধে আছে।" [৫]

সাধারণত ছড়া বলতে আমরা বুঝি, যে সমস্ত ছড়া মায়েরা শিশুকে ভোলানোর জন্য স্বল্পায়তনে ছন্দের মধ্যে বেঁধে সুর সহযোগে উচ্চারণ করে এগুলিকে সাধারণত ছেলেভুলানো ছড়া বলা হয়ে থাকে। যদিও এই ছেলেভুলানো ছড়ার সংখ্যা প্রচুর তবুও একথা বলা যায় যে অন্যান্য যে কোন বিষয় অবলম্বন করেও প্রচুর ছড়া রচিত হয়েছে। ছড়াগুলির গঠনতত্ত্ব দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এগুলি খেয়ালি মনের আবোল-তাবোল শব্দ ব্যবহার, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে অসংলগ্ন বলে মনে হলেও এর অন্তঃস্থলে রয়েছে সমসাময়িক সত্যের একটি চরম রূপ।

লোক সঙ্গীতের প্রবহমান ধারার সঙ্গে যেমন লোকসমাজের গভীর সম্পর্ক তেমনিই এই ছড়াগুলির সাথে বিশেষত আঞ্চলিক উপভাষা গঠিত ছড়াগুলির বহমান ধারার সঙ্গেও লোক সমাজের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। শিষ্ট ভাষায় রচিত সাহিত্যের সঙ্গে তার ব্যবধান প্রচুর বলেই মনে হয়। ছেলেভুলানো ও শিশু ছড়ায় একদিকে যেমন মা ও শিশুর অন্তর্লোকের হদিশ আমরা পাই, তেমনি এই ছড়াগুলিতে আভাসিত হয়ে ওঠে প্রাচীন সমাজচিত্র, তার অর্থনৈতিক স্বরূপ, লোকমানসের বিচিত্র অনুভাব। যেমন ঢাকা জেলায় প্রচলিত এই ছড়াটি-

আয়লো পুলাপুড়ি ফুল টুকানিত যাই।
যেমনি গেলাম ফুল টুকানিত ওমনি আইল বিয়া,
আর ত খেইল খেলতাম নাকো পরের ঘরে গিয়া
পরের পুতে লইয়া যাইব ঢোলে বাড়ি দিয়া
পরের পুতে মারবে
চুল ধরে টানবে।

মধ্যযুগের সমাজে নারীর অবস্থান ছিল মর্যাদাহীনতায় পরিপূর্ণ। কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া মাতার সমাজে কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। মেয়েও বড় হতো অনাদর-অবহেলায়। সাত থেকে আট বছরের মধ্যেই তাকে গোত্রান্তর করা পিতা-মাতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। তা সে পাত্র যেমনই হোক না কেন। বেশিরভাগ শ্বশুরঘরই ছিল স্নেহ-মায়া মমতাহীন। ঢাকা জেলার নিম্নলিখিত এই ছড়াটিতে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে -

সারাদিন চিড়া কুটলাম চিড়া পাইলাম না,
একখান চিড়া মুখে দিলাম শান্তি পাইলাম না।
একখান চিড়া মুখে দিলাম শাশুড়ী মাইল ঠোক্কা,
ঘরের পাছে কানতে গেলাম ভাতারে মারল চাক্কা।
গোয়াইলে গেলাম গোবর ফালতাম,

ষাঁড়ে মাইল গুঁতা।
গাঙে গেলাম হাত ধুইতাম কুমীরে মাইল যাতা,
যাতা মারাইয়া নিদয় কুমীর ঠেঙ্গা দিল টান।
পরের ঘরে অভাগিনীর উড়াইয়া গেল জান।

বিবাহোত্তর জীবনের আনন্দ বেদনার চিত্র পাওয়া যায় লোকছড়াতে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা সন্তান। শুধু নারীরই নয় এই কামনা থাকত পরিবারের এবং সমাজের। তাই নারী সন্তানবতী হলে সেই আনন্দের ছাপ পড়ত ছড়াতে -

এ কোনা মাসের গোকালে নীহারেতে নীলা
দুই না মাসের গো কালে রক্তে বান্ধে গোলা।
তিন না মাসের গো কালে ভাইটাল শরীল।
চাইরিনা মাসের গো কালে ধরে চাইর রাত।
পঞ্চ না মাসের গো কালে পঞ্চ ফুল ফুটে।
ছয় না মাসের গো কালে মায়ের তন লুটে। (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) [৬]

বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি পরিমাণ যে ধরনের ছড়া পাওয়া যায় তা হল ছেলেভুলানো ছড়া। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে শিশুকে যতরকমভাবে জননী আদর করেন, তার দুরন্তপনাকে প্রশ্রয়-আশ্রয় দেন, ও অনিচ্ছুক শিশুকে ঘুম পাড়ান - সব ব্যাপারেই জননী নানা ধরনের ছড়া ব্যবহার করে থাকেন। এই সব ছড়ার মধ্যে শিশুকে ভোলানোর উপাদান যেমন থাকে, তেমনি এই ছড়াগুলিকে কেন্দ্র করে নারীর আশা-আকাঙ্খা ও পাওয়া না পাওয়ার বেদনা কল্পনার ডানায় ভর করে রূপকথার জগতে ভ্রমণ করে। নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধ ও এই সুযোগে নারী পূরণ করে নেয় কাল্পনিক ভাবে। যেমন-

হলদি গাছে হলদে ফুল
মেয়ের বাড়ি কাঞ্চনপুর
বাড়ির কাছে কাচারী
পুঁটি মাছের ব্যাপারী
মাছ কুটব কি করে বটি নিল চোরে,
খুকুমণিকে রাজার ঘরে বিয়া দেব যে রে।
আসবে জামাই বসবে কাছে খাবে পান পাতা,
খুকুমণিকে বললে কিছু, কাটবো জামাইর মাথা। [৭]

অথবা,

আয়রে আয়
কি লেগে কাঁদিস বাছা কি ধন তোর চাই,
খাওয়াইব ক্ষীরখন্ড মাখাইব চুয়া।
পাকা পাকা ধান দিব সরেস গুয়া,
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া,
তুলে এনে দিব গগন ফুল।
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল,
সে মূলে গড়াব হার সোনার,
আমার যাদুরে কেঁদনা না আর।

শিশুদের ভোলাতে জননী শিশুদের জন্যে আলাদা স্বপ্নের জগতে তৈরী করে নেন। সেখানে থাকে একানেড়ে, হাট্টিমা টিম টিম, ব্যঙ্গমা পাখী, সোনার টোপর পড়া টিয়ে ইত্যাদি। যেমন -

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাঁড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্।

সন্তান আর জননীকে ঘিরে যে অসংখ্য ছড়ার সম্পদ ভান্ডার গড়ে উঠেছে সেখান থেকে মৌখিক শব্দের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেন - "ছেলেভুলানো ছড়ায় শিশুকে আমরা যে কত নামে অভিহিত হতে দেখি তার আর ইয়ত্তা নেই। পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্যটি পরিবারের বিশেষ স্নেহ প্রীতির। অপত্য স্নেহতে উৎসাহিত করতে শিশুকে কত নামেই না অভিহিত করা হয় - খোকা, খোকন, সোনা, খুকু, খুকুমণি মণি, ধন এমনি আরও কত কি। শুধু কি তাই। খোকা বা খোকনসোনার ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীও ব্যবহারিক জগতে বহুল ব্যবহৃত, নামকরণ ত্যাগ করে ভিন্নতর নামে পরিচিত ও উপস্থাপিত হয়। সেই কারণে জুতা হয়ে ওঠে জুতুয়া, দুধ হয়েছে দুদু, বেড়ানো বেড়ু। [৮]

ছেলেভুলানো ছড়াগুলি ছাড়া অন্য যে বিপুল সংখ্যক ছড়ার অস্তিত্ব রয়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র তার অন্তঃস্থলে রয়েছে সমসাময়িক সত্যের একটি বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র। যেমন বাংলার সৌন্দর্যময় ভৌগোলিক রূপের কথাই বলা যেতে পারে। ছড়ায় উল্লেখ রয়েছে পূর্ব বাংলার খাল-বিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, মহামারী, দক্ষিণ বাংলায় ডুংরি, ঝর্ণা, জলাশয়, অজয়, দামোদর, বরাকর, শিলাই, সুবর্ণরেখা, ধলকিশোর ও ডুলাং। উঁচু-নীচু জমির গর্ভে খনিজ সম্পদ, বনে-জঙ্গালে বন্যপ্রাণী হিংস্র জানোয়ার আর বিচিত্র রকমের পাখী। এসেছে বিচিত্র সম্প্রদায়ের মানুষ - মাহাতো, বাগদি, বাউরি, মালো, মাহালী, ডোম, হাঁড়ি, কাহার, লোহার, কুমার, ছুতার, গোপ ইত্যাদি।

যেমন

আগডোম বাগডোম্ ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজে।

সামাজিক বিভিন্ন প্রথা বা অনুশাসন যেগুলি বাঙালির নিজস্বতা চিহ্নিত করে, তেমনি আবার মর্মান্তিক মনোবেদনার কারণ হয়েও দাঁড়ায়, যেগুলি হল - সতীদাহ প্রথা, কুলীন প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যা বেচা, কন্যা হত্যা ইত্যাদি। যেমন-

ওপারেতে কালো রং, বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম,
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙ্গা টুকটুক করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
হাড় হলো ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি,
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও বাঙালি এক সময় খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল, যার কারণ ছিল একদিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধ। বাঙালীর এই স্বর্ণ সময়কে লক্ষ্য করে ছড়া লেখা হয়েছে অনেক। এ বিষয়ে আশরাফ সিদ্দিকি বলেন - "ঢাকার মলমল, জামদানী, মসলিন প্রভৃতি শাড়ী একদা বড় গঙ্গার (বুড়ি গঙ্গার তীরবর্তী ডবাক) ঢাকা শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল এবং এসব পণ্য একদা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি গ্রীস দেশেও রপ্তানি হোত। বাংলার (বাংলাবাজার ঢাকা) গৌরব গঙ্গাজল, মুক্তামণি, আসমানতারা প্রভৃতি শত শত বৈচিত্র্যের শাড়ি, যে শাড়ি নিয়ে পূর্বোক্ত চাঁদ সওদাগর বা শ্রীমন্ত

সওদাগরের 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' ভেসে চলত দূর দূর দেশে তা আজ নেই। কিন্তু সেই স্মৃতি ছড়া ধরে রেখেছে।" [৯]

পরথমে পরাইল শাড়ি নামে গঙ্গাজল,
নউখের উপর তুললে শাড়ি করে টল্‌মল্‌;
সেই শাড়ি পরাইয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়।
অইল না তার মনের মত দাসীরে পৈরায়;
তারপরে পরাইল শাড়ি নাম মুক্তামণি,
সাত রাজার ধন লাগগ্যাছে শাড়ির গাঁথুনি।
সেই শাড়ি পরাইয়া কইন্যা শাড়ীর পানে চায়,
দিল-মন না খুশী অইলে খুয়াইয়া ফালায়।
চাঁট গাও, সোনার গাঁও, হরিপুর, মধুপুর লেখছে থরে থরে,
কত পঙ্খীর নাম লেখখ্যা থইছে শাড়ির কিনারে।
সাজিয়া পরিয়া কইন্যা রূপের পানে চায়,
চান সুরুজ লইজ্জা পাইয়া আবের নীচে যায়। [১০]

ছড়া থেকে বাদ পড়েনি রাজনীতিও, তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, লোকছড়ায় কোন বৃহৎ রাজনীতি বা সন্ধি বা ক্ষমতাদখল এইসব ব্যাপার থেকে সাধারণ মানুষের অবস্থান ছিল যোজন হাত ব্যবধানে। সিংহাসন কেন্দ্রিক খবর তাদের কানে পৌঁছত না, তারা বোঝার চেষ্টাও করত না। তবে যে খবরগুলি মানুষের মুখে মুখে জনপ্রবাহের আকারে ফিরত সেই বিষয়গুলি ধরা পড়েছে ছড়ার আকারে। অন্য যে বিষয়গুলি যা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত তা দূরের বিষয় হলেও কিংবদন্তীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের মধ্যে। যে সব ঘটনায় মানুষ নিয়তির অদৃশ্য হাত দেখতে পেত যেমন, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সন্তানসহ যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুতে নাবালক পুত্রের পরাক্রম ইত্যাদি ছড়া রচিত হোত সেইসব বিষয়কে কেন্দ্র করেও যেমন -

নববর্ষ বয়ঃক্রম শিশু একজন
ক্ষুদ্র তরবারি করে ক্ষুদ্র অঙ্গে স্বেদ ঝরে
জনকের মৃত দেহ করিতে রক্ষণ।
শবের নিকটে থাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি
শোনরে শোনরে ওরে পাপিষ্ঠ যবন।
পিতার ও দেবদেহ কভু না ছুঁইও কেহ
ছুইলে তোদের কিন্তু নিকট মরণ,
ক্ষত্রিয় শিশুর শুন ভীষণ প্রতিজ্ঞা।

কয়েকশো বছরের ইতিহাসে বাঙালি রাজনৈতিক টানাপোড়েন দেখেছে প্রচুর। বাঙলার ঐশ্বর্যের লোভে একে একে এসেছে 'শক, হুনদল,পাঠান, মোগল' ইত্যাদিরা। এদের দীর্ঘ চারশত বছরের রাজত্বকালে বাঙালি ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা এল সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা, বুদ্ধি ও কৌশলের চেহারা নিয়ে। বাঙালি সেদিন আবার নতুন করে মোহাবিষ্ট হল, যে মোহ আর আবেগের ফলাফলে বাঙালি পেয়েছে প্রায় দ্বিশতাধিক বছরের পরাধীনতা। এই মোহের স্বরূপও ধরা পড়েছে লোকছড়ায় -

আইল রে ফিরিঙ্গি দল।
দেশটা গেল রসাতল॥
সবার মুখে কোম্পানির দোয়াই।
আল্লাহ রসুল দেশে নাই॥

ইংরেজ দেখখ্যা মাইয়ার দল,
চাইয়া হাসে খল্‌খল্‌।
মনে তাদের কি যে চায় ।।
বাবুয়ানা বিবিয়ানা।
ঘরে বাইরে এক টানা।।
জাইত কুল সব গেছে,
আর কি দেশে মানুষ আছে॥
পশু-পাখির গলায় দড়ি।
কয়দিন পরে দিব ছুড়ি।।
কোরান কালাম কেউ পড়ে না।
এ-বি-সি-ডি এক টানা॥
আল্লাহ আল্লাহ বল ভাই।
কিয়ামতের দেরী নাই।। (নেত্রকোনা) [১১]

ছড়াগুলি অসংলগ্ন পারম্পর্যহীন বলে অনেকে ছড়াগুলিতে আবোল-তাবোল এবং অপরিণত মনের খেয়ালি সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতে চান, কিন্তু গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে এর কোনটিই আবোল-তাবোল বা খেয়ালি মনের সৃষ্টি নয়। আমাদের এই ধরনের ভাবনার কারণ হল ছড়াগুলি যে সময়ের সৃষ্টি সেই কাল, পরিবেশ এবং মানসিকতাকে আজ আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। তাছাড়া ছড়াগুলি যারা রচনা করতেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন প্রথাগত শিক্ষার বাইরে। সুতরাং কোনরকম নিয়মনীতি না জেনেই কেবলমাত্র সৃষ্টির আনন্দেই রচিত হয়েছে এইসব ছড়া। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা আরও প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট - "ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে, সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া দেখেও না, শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যর মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে।"[১২]

লোকছড়ার মধ্যে বাঙালির ইতিহাস বিষয়ক অন্বেষণ প্রক্রিয়া আমরা আটটি অধ্যায়ে সম্পন্ন করেছি।

প্রথম অধ্যায় - ছড়া শব্দটির নানাবিধ আভিধানিক অর্থ, বৈশিষ্ট্য, বিকাশ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের কথা যারা বাঙলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছড়াগুলিকে প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করার কথা ভেবেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় - 'বাঙালির সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান ও লোকায়ত ছড়া।' বাঙালীর অতীত ইতিহাস যে সমস্ত ছড়াগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তার আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় - 'বাঙলাদেশের সমাজ ও লোকছড়া', জাতিধর্ম, কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি অনুশাসনগুলি সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেকদিন - তারই প্রতিফলন রয়েছে যে সমস্ত লোকছড়ায় তাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায় - 'নারী মনস্তত্ত্ব ও ছেলেভুলানো ছড়া' এই অধ্যায়ে 'ছেলেভুলানো ছড়া বলে প্রচলিত 'ছড়াগুলিতে নারীর অবরুদ্ধ মনের ভাব আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় - 'বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও লোকছড়া' একদা সমৃদ্ধ বাঙলা কৃষিজাত, শিল্পজাত যে যে বিষয়গুলির নির্ভর করে গর্ব অনুভব করত তার উৎকর্ষ বিষয়ক এবং অধঃপতনের কারণ নির্ভর ছড়াগুলি সঙ্কলিত এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায় - বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও লোকছড়া। অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী এই বাঙলাদশে, যার প্রতিফলন ঘটেছে আঞ্চলিক রাজনীতিতেও। আলোচ্য অধ্যায়ে রয়েছে সেই রাজনীতির ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায় - 'বাঙলার লোকক্রীড়া ও লোকছড়া' - লোকক্রীড়ায় ব্যবহৃত ছড়াগুলিও বাঙালির অতীত ঐতিহ্য বহন করছে । এই অধ্যায়ে সেই বিষয়টিই উল্লেখিত।

উপসংহার - লোকছড়াগুলি চরিত্রধর্মে অনন্য। অতীত ও আধুনিকতার আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে লোকছড়াগুলিতে। উত্তর আধুনিকতার প্রবক্তাদের মতামত এই অধ্যায়ের আলোচ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৭৫০

২। দত্ত ভবতারন, বাংলার ছড়া, সঙ্কলিত ছড়ার ভূমিকা,পৃঃ ১

৩। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, ছড়া সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বাংলার ছড়া, ছড়ার বাংলা, সম্পাদনা : সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১১

৪। আহমেদ ওয়াকিল, বাংলার লোকসাহিত্য ছড়া পৃঃ ১৪৭

৫। আহমেদ ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া, পৃঃ ১

৬। সিদ্দিকি আশরাফ, লোকসাহিত্য, পৃঃ ৯৭

৭। আহমেদ ওয়াকিল, বাংলা সাহিত্য ছড়া, পৃঃ ৯৫

৮। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, ছড়া ঃ সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ১৩

৯। সিদ্দিকি আশরাফ, লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৪

১০। সিদ্দিকি আশরাফ, লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৪২

১১। সিদ্দিকি আশরাফ, লোকসাহিত্য,পৃঃ ১৮৪

১২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, পৃঃ ৭৫০